প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছোটগল্প

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আর সব কিশোরের মত বিদ্যালয় স্তর থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা লক্ষ্য স্থির করে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পড়তে গিয়েছিল বিজ্ঞান, কিন্তু কোনও এক অজানা অস্থিরতায় কখনও সে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে গেছে শ্রীনিকেতনে, আবার কখনও চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে গেছে ঢাকায়। কিছুতেই মন বসছে না, কিছুতেই বুঝতে পারছে না কী সে হতে চায়। অভিভাবক বলতে তার বুড়ি দিদিমা। নাতির ওইরকম মতিগতি দেখে বিরক্ত হয়ে তাঁর কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন কাশীতে। নাতি যখন ঢাকা থেকে কলকাতায় এল তখন উঠল দিদিমার বাড়ির কাছেই এক মেসে। মেস ঘরের জানলার ফাঁকে পেল একটা পুরনো পোস্টকার্ড। কৌতূহলভরে পোস্টকার্ডটায় চোখ বুলিয়ে দেখল, কেনও এক গাঁয়ের বউ চিঠিটা লিখেছে কলকাতায় চাকুরিরত মেসবাসী তার স্বামীকে, কোনও বড় খবর নেই তাতে, আছে তার গাঁয়ের সংসারের ছোটোখাটো সুখদুঃখের কথা।

সেই চিঠি পড়ে এই অস্থিরমতি দিশেহারা নবীন যুবকের মনে বীজ থেকে ঝলকে ঝলকে বেড়ে উঠল একটা গল্পের নটে গাছ। কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসল সেই গল্প। গাঁয়ের বউয়ের গল্প নয়, কোনও এক গাঁয়ের মেয়ের তার মতো শহরবাসী এক নবীন যুবকের ছোট ঘরে বউ হয়ে সংসার সাজাবার গল্প, কিন্তু তাদের ভালোবাসার ছোট ঘরের উপরেও একদিন বিরাট দুঃখ আছড়ে পড়ে। গল্পের নাম দিল 'শুধু কেরানি'। লেখা শেষ করে মনে হল এ তো বিয়ের পরে শহরে আসা গাঁয়ের মেয়ের স্বপ্ন ভাঙার গল্প হল, শহরের ছেলে গাঁয়ে গিয়ে কোনও এক মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে তেমন একটা গল্পও তো হতে পারে। মানে 'শুধু কেরানি'-র অপর পিঠের গল্প। আগের গল্পটি শুরু করেছিল এইভাবে —'তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়।' এবারকার গল্পটি শুরু করল এইভাবে — 'মনে আছে সেটা আকাশ - প্রদীপ দেওয়ার মাস।' এই গল্পটির নাম দিল 'গোপনচারিণী'। শহরের ছেলে গ্রাম বাংলায় কোনও কাজে কিছুদিনের জন্য গিয়ে সেখানে যে মমতার যে করুণার স্পর্শ পেয়েছিল তা কোনও এক তরুণীর, কিন্তু তাকে চোখে দেখেনি, শুধু শুনেছে যে সে এক বালবিধবা, কিন্তু যেটা বুঝতে পারেনি সেটা হল ওই মমতা - করুণার পেছনে শুধুই স্নেহ ছিল, না কি অন্য কিছু মনোবৃত্তি ছিল! এক রাত্তিরে লেখা গল্প দুটি পরদিন 'প্রবাসী' পত্রিকার উদ্দেশে ভবানীপুর পোস্টাপিসের বাক্সে ফেলে সেই যুবক ঢাকায় ফিরে গেল দাদামশায়ের মত ডাক্তার হবার জন্য বিজ্ঞান পড়তে।

তখনকার কালের সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী', তাতেই ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় বের হল 'শুধু কেরানি' আর ১৩৩১ -এর বৈশাখ সংখ্যায় 'গোপনচারিণী'। একেবারে নতুন ব্যঞ্জনার নতুন স্বাদের গল্প। সাহিত্যপ্রেমিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। একই লেখকের লেখা দুটি গল্প। কে এই অসাধারণ গল্প দুটির লেখক? প্রেমেন্দ্র মিত্র। এইভাবেই ছোটগল্পের লেখক রূপে বাংলাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব। ছোটবেলা থেকেই ছিল কবিতা লেখার হাত। উপন্যাসও একটা লেখা শুরু করেছিলেন বস্তির জীবন নিয়ে, কিন্তু সে উপন্যাস কখনও মন হলে লেখেন, মন না হলে লেখেন না। তখনও ভাবেননি যে তিনি কবি বা সাহিত্যিক হবেন। কিন্তু 'প্রবাসী' - তে গল্প দুটি প্রকাশের পরে তিনি ঠিক করে ফেললেন, না, তিনি ডাক্তার হবেন না, সাহিত্যিক হবেন। ফলে ঢাকায় বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন সাহিত্যের পথে জীবন গড়ে তোলার জন্য। ইতিমধ্যে নতুন সাহিত্যের মুখপত্র রূপে 'কল্লোল' পত্রিকা বেরিয়েছে আর তাতে বিশেষ প্রশংসা বেরিয়েছে 'শুধু কেরানি'র। স্কুলের বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে 'কল্লোলে'র সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠল। 'কল্লোল' প্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রথম গল্প এক চরম হতাশার গল্প — অতলস্পর্শী হতাশার জীবন্ত প্রতিমূর্তি অখিল আত্মহত্যার জন্য আফিম খাওয়ার পরে তার পূর্ব প্রণয়িনীর একটি চিঠি পেয়ে আবার বাঁচার জন্য আকুল হয়ে উঠল, কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেথে। অস্তিত্বের অর্থহীনতার এ এক মর্মস্পর্শী রূপায়ণ।

সাহিত্যের আসরে যাদের এতকাল প্রবেশাধিকার ছিল না প্রেমেন্দ্র মিত্র সেইসব আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত, সেইসব দুঃখী লাঞ্ছিত মানুষদের কাহিনীকে ভাবাবেগ বর্জিত ভাষায় ও ভঙ্গিতে উপস্থাপন করলেন বাংলা সাহিত্যে। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'পোনাঘাট' পেরিয়ে'র চরিত্রগুলির জীবন ও জীবিকা তাদের উদারতা ও নীচতা, তাদের প্রতিহিংসা ও বিমূঢ়তা সবই বাংলা সাহিত্যে নতুন। একই কালে লেখা তার আর একটি গল্প 'সত্যমিথ্যা'-র নায়ক অপূর্ব শুধু মিথ্যে গল্প বানিয়ে লোক ঠকানোতেই ওস্তাদ নয়, হাত সাফাই করে পকেট সারাতেও পাকা, অপরাধের জগতে স্বভাবতই তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ, এমন জঘন্য চরিত্রের এমন জীবন্ত চরিত্রায়ণ আমি আর পড়িনি এবং এমন একটি চরিত্রের প্রতি এমন করুণাও কখনও অনুভব করিনি। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রর অনন্য প্রতিভা — অত্যন্ত ঘৃণ্য মানুষকেও তিনি এমন মমতার পাত্র রূপে উপস্থাপনা করেন যে পাঠকের মনে অনিবার্যভাবে নিজের নির্ভুল বিচার সম্বন্ধেও প্রবল সন্দেহ জাগে। মনে হয় সমস্ত সত্যের পেছনেও রয়েছে কোনও অকাট্য মিথ্যে। অর্থাৎ বাইরে থেকে আমরা যা দেখি তার ভেতরে লুকিয়ে আছে অন্য এক সত্য। এই অন্দর -

বাহিরের দ্বন্দ্বকে, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে তার সিদ্ধান্তকে প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের পর গল্পে উল্টেপাল্টে নানাভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। 'এই দ্বন্দ্ব' গল্পটিতে পরীর সঙ্গে পতিতপাবনের বিয়ে হয়, কিন্তু পরী তার ভালোমানুষ স্বামীটির থেকে দূরে দূরে থাকে, কেন তার এমন আচরণ তা আমরা বুঝতে পারি বাপের বাড়িতে এসে পরী যখন ধূর্ত তুখোড় শরতের মুখোমুখি হয় এবং শরতের আলিঙ্গনে কেঁদে ফেলে বলে, 'তুমি আমার স্বামীর চেয়ে কত নীচ কাপুরুষ জানো? তবু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে আমি ভালোবাসতে পারছি না?' এবং তখন বিজয়ের হাসি হেসে পরীকে আরও বুকের ভিতর টেনে শরৎ বলে, 'তা হোক, মেয়েদের স্বভাবই ওই।' এর পর লেখকের একটি অর্থগর্ভ মন্তব্য — 'অসীম ঘৃণা ও অদম্য প্রেম মনের মধ্যে এমন করিয়া জট পাকাইয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারে পরী বোধ হয় তাহাই ভাবিতে ছিল।' অর্থাৎ শুধু যে পাঠকের কাছেই অপূর্বর মতো চবিত্রকে করুণার পাত্র না ঘৃণার পাত্র কোন জাতের মানুষ বলে চিহ্নিত করতে ধাঁধা লাগে তা-ই নয়, পরীর মত অনেকে নিজের মনকেও চিনতে বিভ্রান্ত হয়।

মানুষের মনের মধ্যে যে আরও একজন বা আরও কয়েকজন মানুষ বাস করে তার প্রতিদিনের অভ্যস্ত পরিচিত রূপের গভীরে যে আত্মগোপন করে থাকে এক চিরন্তন বহুরূপী এই ব্যাপারটাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র বারবার অনবদ্য শিল্পরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর বহুপঠিত গল্প 'সাগর সঙ্গমে' দেখি, নৌকো করে একদল তীর্থযাত্রী চলেছে সাগরসঙ্গমে, যাত্রীদের মধ্যে একজন দাক্ষায়ণী, যেমন তাঁর আচারনিষ্ঠা তেমনই তাঁর ধর্মপ্রাণতা এবং সেজন্য গ্রামের সকলের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন, তবে শ্রদ্ধার চেয়ে সবাই তাঁকে ভয় করে বেশি তাঁর ধারালো মুখের জন্য। যখন থেকে তিনি জেনেছেন যে এই নৌকাতে কজন বেশ্যাও যাচ্ছেন তখন থেকে তিনি নৌকোয় জলগ্রহণ করেননি। বেশ্যাদের এক বছর আষ্টেকের মেয়েও চলেছে এই নৌকোয়। তার নাম বাতাসি। দাক্ষায়ণী ও বাতাসির মধ্যে সাপে নেউলের সম্পর্ক। জোয়ারের টানে একটা বড় নৌকোর ধাক্কায় এই তীর্থযাত্রীদের নৌকো গেল উল্টে। কে কোথায় যে তলিয়ে ভেসে গেল কে জানে। ডুবতে ডুবতে দাক্ষায়ণী যাকে অজ্ঞানে রক্ষা করলেন সে বাতাসি। যখন বুঝলেন যে তিনি বাতাসিকে বাঁচিয়েছেন তখন প্রথমে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন করে দাক্ষায়ণী ও বাতাসির মধ্যে একটা প্রবল গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল তারই মর্মস্পর্শী গল্প 'সাগর সঙ্গমে'। নিজের মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ যে কত অচেতন এ গল্প সেই মানবিক সত্যের অমোঘ প্রশান্ত উন্মোচন।

মানুষের মনের গতি পরিস্থিতি অনুসারে কী রকম পরিবর্তিত হয় তার এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত রয়েছে 'পুন্নাম' গল্পটিতে। চার বছরের অসুস্থ ছেলের সারাদিন কান্না আর অন্যায় বায়নায় তিতিবিরক্ত হয়ে ছেলের পিঠে থাপড় মেরে মা ছবি বলে, 'মর না, মরলে যে হাড় জুড়োয় আমার।' ললিত স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে অসুখে ভুগে ভুগে ছেলেটা অমন খিটখিটে অমন বায়নাবাজ হয়েছে। শিশু কিন্তু মায়ের আঁচলই সজোরে চেপে ধরে রাখে। ঝটকা দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে ছবি বলে, 'তা মরুক না! মরলে বাঁচি।' এ সমস্তই ছবির চরম বেদনার বিকৃত প্রকাশ। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে ছবি। তারপর ডাক্তারের পরামর্শে কী ভাবে যেন টাকা জোগাড় করে ললিত ছেলে ও ছবিকে নিয়ে এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় যায়। সেখানে তাদের প্রতিবেশীর ছেলে টুনু স্বাস্থ্যে ভরপুর, অসুখ রুগ্ন শিশুটির প্রতি তার যত্ন - ভালোবাসা অপরিমেয়। অথচ টুনুর প্রতি রুগ্ন শিশুটির হিংসে-বিদ্বেষ অসীম। হাওয়া বদলে রুগ্ন শিশুটি ক্রমশ সেরে ওঠে, কিন্তু কোন অজাত অসুখে টুনু ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কদিন বাদে মাঝরতে টুনুদের বাড়ি থেকে কান্না ভেসে এলে ছবি কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কাল বড্ড বাড়াবাড়ি গেছে, বোধ হয় মারা গেল।' কিছুদিন আগে যে-ছবি নিজের অসুস্থ সন্তান সম্বন্ধে মৃত্যু কামনা করেছিল আজ সেই শিশু সেরে যাওয়ার পরে অন্য শিশুর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেছে। অবস্থা বিশেষে একই মায়ের মন দুভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তারপরে এসেছে ললিতের পিতৃহৃদয়ের যন্ত্রণার কথা। চুরি করে সে এই চেঞ্জে আসার টাকা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তার চুরির কথা কেউ জানবে না, শুধু নিজেই নিজেকে খোঁচা দেবে। নিজেকে শান্ত করার জন্য দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রাতের আকাশের নিচে। গল্প শেষ হয়েছে অপরাধী ললিতের বিচিত্র আত্মোপলব্ধিতে —'বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই তলায় তার মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগযুগান্তর ধরে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি।' কীসের জন্য প্রতীক্ষা তা কিন্তু গল্পকার স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি, আমাদের বুঝে নিতে হয় অকাল মৃত্যুর শঙ্কাহীন ও অপরাধহীন এক পৃথিবীর জন্য লেখকের প্রত্যাশাকে।

মনুষ্যচরিত্রের নিগূঢ় দুর্বলতা নিয়ে একটি স্বল্প-আলোচিত গল্প 'জীবনযৌবন'। তিনকাল গিয়ে এককালে এসে পৌঁছেছে কৃত্তিবাস, তবু ঘরে যে বিধবা মেয়ে একা দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কী অবস্থায় আছে, তারা খেয়েছে কি মরেছে, এসব নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কৃত্তিবাস যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার দু সাথী নিয়ে দিব্যি দিন কাটায়। তার দুই সাথীর মধ্যে রামকমলের আর্থিক অবস্থা অন্য দুজনের চেয়ে ভালো। কর্মজীবনের নাজিরগিরি করে যথেষ্ট পয়সা কামিয়েছিল, তবে অপব্যয়ও করেছিল বিস্তর, যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তার দেহ এখনও

সতেজসুন্দর আর তা ধরে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক সে। তিনজনের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো সদানন্দ, কিন্তু শরীরে সে-ই সবচেয়ে বুড়ো। রামকমলের বাড়িতে বসে তাদের নেশার আসর। নেশারিদের আচার - স্বভাবকে প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নেশারি - চরিত্রের কোনও পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় না, সেই চরিত্রই বরং এখানে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। লেখকের দেওয়া জীবন্ত সংলাপের অংশ নয়, বিশ্বস্ত বর্ণনার অংশ থেকে একটা উদ্ধৃতি দিই— 'যৌবন যাহাদের গিয়াছে তাহাদের যৌবন স্মৃতির কাহিনি তারপর আর থামিতে চাহে না। পুরান কাহিনিগুলির তাহারা সানন্দে পুনরাবৃত্তি করে। দিনের পর দিন একই কথা তাহারা বলিয়া আসিয়াছে ও পরস্পর পরস্পরকে তারিফ করিয়াছে। স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিয়াই তাহারা কোনোরকমে যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে চায়'। এদিকে কৃত্তিবাসের ঘরে তার নাতনির জ্বরের ঘোর ক্রমশ বেড়েই চলে। তখন তার মেয়ে সুশীলা তার শেষ গয়নাটি বাবাকে দিয়ে বলে ওটি বিক্রি করে তার টাকায় একজন ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য। কৃত্তিবাস গয়নাটি বিক্রি করা টাকায় বন্ধুদের নিয়ে মৌজ-মজা করতে বেরোয়। নেশাড়ি চরিত্রের এমন ভয়ঙ্কর রূপ বাংলা সাত্যে আর কেউ এঁকেছেন বলে জানিনে। এর ভেতরে শুধু নেশাড়ির ঘৃণ্য রূপই নেই, আছে নেশার কাছে নেশাড়িদের নিদারূণ নিরুপায় অবস্থার কথাও। কৃত্তিবাস যেখানে বলে ওই টাকায় নেশা - ফুর্তি করতে করতে তারা মরতেও প্রস্তুত সেখানে তাদের নেশাড়ি অস্তিত্বের চূড়ান্ত অসহায়তাই ফুটে ওঠে আর পাঠকের মনে সেই সঙ্গে জাগে তাদের প্রতি করুণা ও জুগুপ্সা।

'জীবনযৌবন' গল্পটিতে প্রেমেন্দ্র যেমন নেশাড়ি চরিত্রের স্ব রূপ প্রকাশ করেছেন মনোচিকিৎসকের নির্বিকারতায় তেমনই 'ভস্মশেষ' গল্পে প্রেমিক চরিত্র কালের প্রতাপে কীভাবে বর্ণাঢ্যতা হারিয়ে ফিকে হতে হতে ফ্যাকাসে অভ্যাসের দাসত্ব হয়ে যায় তারই এক মর্মান্তিক পরিণতিকে তিনি পরিবেশন করেছেন নিরাবেগ নিরুত্তাপ লেখনীতে। গল্পটির পটভূমিতে আছে এক আবেগে আকুল ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি—যার সৌন্দর্য এখনও ইতিহাস হয়ে যায়নি সেই সুরমার জন্য কোনও এক অতীতে অমরেশ ডাক্তারের বুকে জ্বলে উঠেছিল লেলিহান আগুন। বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সুরমার মনেও, তবু সুরমা শেষ পর্যন্ত জগদীশবাবুকে ফেলে বেরিয়ে পড়তে পারেননি আর অমরেশ ডাক্তারও হতাশায় বিবাগী হয়ে যাননি, থেকে গেছেন সুরমা - জগদীশেরই সংসার সীমান্তে। তারপর তাঁরা এসে পৌঁছেছেন বর্তমানের বারান্দায়। এখানে মূল গল্পটি কীভাবে শুরু হয়েছে তা উদ্ধৃত করি — 'বারান্দার এ দিকটা সরু। নিচে নামবার সিঁড়িও খানিকটা ভেঙে পড়েছে। তবু সন্ধ্যের আগে এই দিকেই চেয়ারগুলো ও টেবিল পাতা হয় — এদিকে থেকে দূরে পাহাড় আর নদীর খানিকটা দেখা যায় বলে। কৈফিয়তটা নিরর্থক। পাহাড় ও নদী অবশ্য কেউ দেখে না আজকাল। একদিন হয়ত সত্যিই সেটি দেখা ছিল বড় কথা, এখন আর তার কোন অর্থ নেই। যা ছিল আনন্দ তা আজ অর্থহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।' শুরুতেই মানুষের বদলে চেয়ার - টেবিলের উল্লেখ করে লেখক যাদের নিয়ে গল্প তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রাণহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তারপর ইঙ্গিতটাকে স্পষ্ট করেছেন 'অর্থহীন অভ্যাস' শব্দ বন্ধে। একে একে আসেন গল্পের পাত্রপাত্রী। প্রথমে গৃহকর্তা জগদীশবাবু তার পর গৃহকর্ত্রী সুরমা, সবার শেষে অমরেশ ডাক্তার এসে বসেন সুরমার সামনাসামনি। এই দুজন পুরুষেরই উপরে সুরমার যে প্রচুর কর্তৃত্ব আছে সেটা শীঘ্রিই প্রকাশ পায়। ঘরে ফেলে আসা দোক্তার কৌটোটা নিয়ে আসার জন্য সুরমা যখন স্বামীকে 'যাও -না গো তুমি একটু' বলেন তখন তাতে একটু আবদারের সুর থাকে, কিন্তু জগদীশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ডাক্তার এসে হাজির হলে তাঁকেই কৌটোটা নিয়ে আসার কথা বলেন সুরমা। কীভাবে বলেন? আদেশের সুরে কি? লেখক জানিয়েছেন, 'আদেশ নয়, অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।' গল্পের শুরুতে যে - প্রস্তাব রাখা হয়েছে তারই বিস্তার দেখিয়ে সমস্ত গল্পের শরীরে। অন্তিম তরঙ্গে এসে লেখক জানিয়েছেন যে সুরমা যখন ডাক্তারের সঙ্গে ঘর ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন তখনই জগদীশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সুরমা ও ডাক্তার অপেক্ষা করেছেন —'বড় বেশি দিন অপেক্ষা করেছে। ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিবে। কখন আর বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে, তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধুলোয়।'

'ভস্মশেষ' যেমন প্রেমের আগুন নিভে গিয়ে অভ্যাসের ছাই পড়ে থাকার কাহিনী তেমনই 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনি' প্রেমের জোয়ার থেকে ভাটা নামার কাহিনি, তবে ভাটার চেয়ে লেখকের কাপুরুষতাই যেন অধিকতর সত্য হয়ে ফুটেছে এই গল্পে। এক সময়ে লেখকের প্রতি করুণার প্রেম ছিল, হয়ত লেখকেরও ছিল করুণার প্রতি, কিন্তু লেখকের সাহস ছিল না। বাস্তবতার বাধা ভেঙে করুণাকে বিয়ে করার। করুণাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার অভিভাবকরা পাটনায় মামাবাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেও লেখক কোনও পদক্ষেপই নিতে পারল না। পাটনায় করুণার বিয়ে হয়ে যায়। বছর কয়েক বাদে লেখক কর্মোপলক্ষ্যে কয়লা খনির অঞ্চলে গিয়ে সমাপতনভাবে যে - বাড়িতে রাতের আশ্রয় পেল গৃহকর্তার দাক্ষিণ্যে সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী করুণা। এই বাড়িতে স্বল্পকাল অবস্থানের অবসরে দুজনের মধ্যে পুরনো সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলে করুণাই জোর করে লেখককে

বিদায় দেয়। স্টেশনে পৌঁছে লেখক ট্রেন আসার অনেক দেরি আছে দেখে এধার ওধার গোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ করুণাকে স্টেশনে দেখতে পায়। করুণা অর্থপূর্ণভাবে বলল, 'দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।' তারপর আরও ভেঙে বলব, 'সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনও?' এবার একেবারে সরাসরি বলল, 'তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না? যাবে না নিয়ে বলো?' কিন্তু লেখকের ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দেখে করুণা বিদ্রুপের হাসি হেসে জানাল, আসলে সে এসেছে পিসিমাকে নিতে তিনি কলকাতা থেকে আসেন। কথাটা সত্য না মিথ্যে না জেনেই লেখককে চলে আসতে হয় হয়ত তার কাছে আর - একবার সুযোগ এসেছিল প্রেমের জোয়ারে ভেসে পড়ার, কিন্তু তার জন্য এবারেও সে সাহস জোগাড় করতে পারেনি। আর পাঠকের কাছেও একটা ধাঁধা থেকে যায় — করুণা কি লেখকের সঙ্গে ভেসে পড়বে বলেই স্টেশনে এসেছিল, নাকি সত্যিই পিসিমাকে নিতে এসেছিল! পাঠকের এই অজানা উত্তরের বিমূঢ়তার মধ্যেই গল্পের শেষ। কিন্তু আমাদের উত্তর খোঁজা শেষ হয় না।

দুঃসাহসী পুরুষের দেখা পাই 'ইকেবানা' -র অনুপমের মধ্যে। কিন্তু সে দুঃসাহসী, না মূর্তিমান শয়তান, যে নীলিমার অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার জন্য, সোজা কথায় ব্ল্যাকমেল করার জন্য হাজির হয়েছে? হয়তো শয়তান নয়, হয়তো নেহাতই নেশাড়ি বা নীচ, ইতর। মোটের উপর অনুপমের চরিত্রকে কোনও গুণে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, কেননা সত্যিই তার উপমা পাওয়া ভার, সার্থকনামা অনুপম। চিত্রাখ্যানের ঢঙে লেখা এই গল্পেও আছে দুজন পুরুষ ও একজন নারী অর্থাৎ নীলিমা, তার আগে স্বামী অনুপম ও তার নতুন স্বামী শুভঙ্কর, অবশ্য পুরো কাহিনিতেই শুভঙ্কর নেপথ্যবাসী। গল্পের শুরু হয়েছে শুভঙ্কর ফিরবে বলে নীলিমা ঘর সাজাচ্ছে আর ঘর সাজাবার একটা অংশ হিসেবে জাপানি ইকেবানার কায়দায় সাজাচ্ছে ফুলদানি, এমন সময় অলক্ষিতে অনুপম উপদ্রবের মতো ঢুকে পড়ে ঘরে। কথাবার্তায় সে যেমন চৌকস তেমন নির্লজ্জ। নীলিমা তার হাতে যা টাকা আছে তা-ই দিয়ে অনুপমকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে, কারণ মফস্বলের কাজ সেরে শুভঙ্করের ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। এমন সময় নিচের দরজার কলিং বেল বাজে, নীলিমা দরজা খুলে দিতে নেমে যায় নিচে। না, শুভঙ্কর নয়, শুভঙ্করের টেলিগ্রাম — তার কাজ শেষ হয়নি বলে সে আজ রাতে ফিরছে না। টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে দোতলার ঘরে ফিরে এলে অনুপম টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'রাস্তা তো আমাদের পরিষ্কার। আজকের রাত্রের মতো কোনো ভাবনা নেই। কী মহাপ্রলয় হয় পৃথিবীতে যদি থেকে যাই।' ইতিমধ্যে তার ধূর্ত সুবিধাসন্ধানী চরিত্রের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তার পরবর্তী পদক্ষেপ অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। নীলিমাও কি আন্দাজ করতে পেরেছে? অনুপম অনেকক্ষণ নীলিমার চোখে চোখ রেখে সশব্দে হেসে বলল, 'না, পকেটের এই টাকাগুলো ওড়বার জন্য ছটফট করছে। যেতেই হয় সুতরাং।' সে চলে যাওয়ার পরে নীলিমা বেশ কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যখন তার সাজানো সেই ফুলদানিটার দিকে তাকাল তখন দেখল বাহারি ফুলপাতার মধ্যে তিনটে শুকনো, কাঁটা-ওঠা, মরা কাঠি আঁকাবাঁকা ভাবে পোতা। এই ভাবেই টেলিগ্রামের পিয়নের আসার সুযোগে অনুপম তার মনের কথা প্রকাশ করে গেছে নীলিমার উদ্দেশে। কী তার মনের কথা? ওই কাঠিগুলো দিয়ে কী সে বলতে চেয়েছে? আমরা হয়তো নিজের নিজের মতো করে উত্তর দেব, কারও সঙ্গে হয়তো কারও মিল হবে না। এমন অনেকান্ত ব্যঞ্জনার গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া আর কে লিখতে পারেন!

এইসব গল্পে যেমন দুজন পুরুষ আর একজন নারীকে নিয়ে ত্রিকোণ রচিত হয়েছে তেমনই দুজন নারী একজন পুরুষ নিয়ে জটিলতার গল্প 'ভূমিকম্প', 'স্টোভ', 'সাপ' ইত্যাদি। 'ভূমিকম্পের' শশাঙ্কের স্ত্রী মালতী বারবার এক দুর্ভেদ্য বর্মের মতো কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে নিজেকে সুদূর করে রেখেছে। সংসারে স্ত্রীর সমস্ত কাজ নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে করতেও একটা অনতিক্রম্য বাধা সে কেমন করে তুলে রাখে তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য দৃশ্যের পর দৃশ্য আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কখন যে প্রেমেন্দ্র মালতীর মনের কূটৈষার কারণটিকে হাতসাফাইয়ের কৌশলে উল্লেখ করে গেছেন তা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। গল্পের শেষে হঠাৎ আসে ভূমিকম্প। তখন কিছুক্ষণের জন্য মালতী ধরা দিয়েছে শশাঙ্কের বুকে। পরস্পরকে জড়িয়ে তারা ঘরের বাইরে যাবে বলে দ্রুতপায়ে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। এমন সময় ভূমিকম্পের দোলায় একটা ছবি সশব্দে দেওয়াল থেকে মেঝেতে পড়লে কর্তব্যপরায়ণ মালতী যেই সেদিকে পা বাড়িয়েছে অমনই শশাঙ্ক বাধা দিল। তারা যখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির নিচে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ ভূমিকম্প থেমে গেছে। আবার মালতী নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। শশাঙ্কের আলিঙ্গন থেকে, ওপরে উঠে এসে কুড়িয়ে নিয়েছে ছিঁড়ে পড়া ছবিটা। কাচটা শুধু ভেঙে গেছে। শান্ত স্বরে শশাঙ্ককে বলল, 'সকালে কাচ বাঁধিয়ে নিয়ে এসো'। এবার পাঠকের খেয়াল হয় যে আগে এক জায়গায় প্রেমেন্দ্র জানিয়েছেন যে বিয়ের প্রথম দিনই তার প্রথমা স্ত্রীর ছবির সামনে মালীতকে নিয়ে গিয়ে শশাঙ্ক বলেছিল, 'ও ঘরে ওর অপমান যেন কখনও না হয় মালতী। কোনও দিন যেন আমরা মনে না করি ও শুধু একটা ছবি।' তাই বাড়িতে আসার পর থেকে মালতী সে রকমই আচরণ করে এসেছে যেমন আচারণ তার জ্যেষ্ঠ্য সপত্নীর উপস্থিতিতে শোভনীয়। শুধু ভূমিকম্পের সময়টাতে তার আচরণের কিছুক্ষণের জন্য ব্যতিক্রম ঘটেছিল

এইসব গল্পে আমরা বারবার দেখি যে মানুষের মনের অতল অন্ধকারে কতরকম কুটৈষা সন্তর্পণে বিচরণ

করে, কত রকম সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আমাদের জানন ও বোধের বাইরে সারাক্ষণ ক্রিয়াশীল, সেইসব কূটৈষা ও মনস্তত্ত্বকে চরিত্রে সংলাপে বর্ণনায় গল্পের আকারে কেমন নতুন নতুন দ্যোতনায় রূপময় হয়ে উঠছে। প্রেমেন্দ্রর লেখায় কোনও ধ্রবসত্যের প্রস্তাবনা নেই, আছে নতুন নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এক-এক চরিত্রের এক-এক রকম প্রতিক্রিয়া, তাঁর গল্পরাজ্যে সবই আপেক্ষিক, সবই স্থান - কাল - পাত্র সাপেক্ষ, সমস্ত সমাপ্তির পরেও থাকে নতুন সম্ভাবনা। অভ্যস্ত প্রাত্যহিক ঘটনাবলির মেলাতে হারিয়ে যাওয়া আত্মস্বরূপকে তিনি যেন তাঁর গল্পে গল্পে অবিরাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং যা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন তা এক-এক চরিত্রের টুকরো টুকরো সত্তা, অলভ্যই থেকে যাচ্ছে মানবের অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্তা যার বন্দনায় মুখরিত ঋষি-সাহিত্য। বিষয়ে ও প্রসঙ্গের প্রগাঢ় তন্নিষ্ঠাকে, অভিজ্ঞতার অন্তরালে নিহিত অনুভূতিকে এবং ঘটনার পেছনে গুপ্ত নিগূঢ় বেদনাকে কাহিনিতে এবং বাচনে রূপময় করে তোলার নিরন্তর প্রয়াসে প্রেমেন্দ্রর গল্পগুলি বিশিষ্ট। এমন সংযত লেখনীতে এমন দ্যোতনাগর্ভ ছোটগল্প বাংলাতে আর কেউ লেখেননি।

আবার কোনও কোনও গল্পে, যেমন 'মহানগর' বা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' প্রভৃতি গল্পে আমরা দেখি, গল্পাংশ কত নগণ্য, গল্পাংশ প্রায় নেই বললেই চলে, শুধু একটা সম্ভাবনাময় আবহ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে সুনির্বচিত শব্দের সযত্ন সমাবেশে, ভাষার নিপুণ বিন্যাসে যথাস্থিত অথচ বিস্ময়কর বহুতর চিত্রকল্পের পরিবেশনে এবং তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কাহিনির ক্ষীণ স্রোত। 'মহানগর' গল্পের প্রথম আড়াইশো শব্দে কলকাতার নাগরিক জীবনের সাধারণ বিবরণ অসাধারণ সমৃদ্ধ ভাষায় হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য কবিতা। তারপর সংসকোচে একটি শাখা নদী প্রবেশ করেছে গল্পের শরীরে আর সেই স্রোতে ভেসে এসে মাঝিরা নৌকো বেঁধেছে পুরনো পোনাঘাটে। আরও প্রায় দেড় শো শব্দের উজান পেরিয়ে আমরা পাব এই গল্পের নায়ক রতনের দেখা। মহানগরের ভিড়ে সে এসেছে তার সেই প্রিয় দিদিকে খুঁজতে যার নাম করা বাড়িতে মানা। এই মহানগরের কিছুই সে চেনে না, জানে না, তবু অনেক ঘুরে অনেক হয়রানির পর দিদিকে খুঁজে পায় একটি গলির মেটে - বাড়িতে। দিদিও ছুটে এসে ভাইকে বুকে চেপে ধরে, কিন্তু ভাইয়ের কথা শুনে বাড়ি ফিরে যেতে পারে না, আবার আদরের ভাইকে কাছে রাখতেও পারে না, অগত্যা কিছু টাকা ভাইয়ের হাতে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠায়। মনের দুঃখে দুর্বল পায়ে রতন ফিরে চলে, এসে পড়ে বড় রাস্তায়। এই পর্যন্ত সবই ঘটে পাঠকের প্রত্যাশামতো। বাকিটুকু উদ্ধৃত করি— 'কিন্তু বড়ো রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কী সে ভেবেছে কে জানে। চপলা তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে— বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না'। বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।' প্রেমেন্দ্র লেখা গল্প শেষ হল, শুরু হল পাঠকের মনে বড় - হয়ে ওঠা রতনের গল্প লেখা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তেমন একজন অসাধারণ গল্পলেখক যিনি পাঠককেও প্রণোদিত করেন তাঁর লেখা গল্পের না-লেখা অংশটাকে বাদ অংশগুলিকে মনে লিখে ফিলতে। ইচ্ছে করেই তিনি অধিকাংশ ছোটগল্পে এমন কিছু অবকাশ রাখেন যেখানে থাকে পাঠকের কল্পনার উড়ে বেড়াবার জন্য অনেক আকাশ। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব, তাঁর স্বতন্ত্রতা। আরও অনেক রকমের অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। 'হয়ত', 'শৃঙ্খল' প্রভৃতি গল্পের অবলম্বন মানুষের চরিত্রের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা আর - এক কূট চরিত্রের জেগে ওঠার কাহিনি, বাইরের ঘটনা যেখানে মূল কাহিনিকে অল্পই প্রভাবিত করে বা আদৌ করে না, আবার 'সংসার সীমান্তে' বাইরের বিধান এসে চুরমার করে দেয় এক সুন্দর প্রস্তুতিকে। সব গল্প নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই এখানে, মাত্র কয়েটি গল্পের আলোচনা করলাম, অধিকাংশ গল্পই অনালোচিত থেকে গেল, এমনকী সেগুলির উল্লেখ পর্যন্ত করা গেল না বলে খেদ রয়ে গেল।